মোজাম্মেল হোসেন ত্বোহার সাহিত্য সংগ্রহ

জিন্দা লাশ

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

সংগ্রহ - মোজাম্মেল হোসেন ত্বোহা

সিরত - লিবিয়া

Mobile No: +218 92 7058964

toha_mh@yahoo.com & tohamh@gmail.com

http://tohamh.googlepages.com

http://www.somewhereinblog.net/blog/toha_mhblog

জিন্দা লাশ

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

শংকর বাসস্ট্যান্ডের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আহমদউল্লাহ এক গভীর দার্শনিক ভাবনা ভাবছিল। অফিসের সময়, ৯টা বাজে, যান-মানুষে সয়লাব রাস্তাঘাট। একেকটা বাস আসে আর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা যাত্রীসকল আহমদউল্লাহর চোখের পলক ফেলার সময়ের আগেই হুড়মুড় করে বাসে উঠে পড়ে। সে যতই চেষ্টা করুক না কেন, একটা বাসের পাদানি পর্যন্ত যেতে পারল না। বেচারা আহমদউল্লাহ-বাঁ পাটা একটু খাটো অথবা ডান পাটা একটু লম্বা, ওই একই কথা-তার পক্ষে স্বাভাবিক সময়েই বাসে ওঠা কষ্টের, আর কিনা এই ভূততাড়িত অফিসপ্রহরে! সময়মতো অফিসে না গেলে সমস্যা হবে না তার, যেহেতু তার অফিস, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে এমনিতেই কাজকর্ম কম, এক প্রতিযোগিতা-টোতিযোগিতা না হলে। এখন ভর ভাদ্রকাল, খেলোয়াড়রা বিশ্রামরত। তা ছাড়া আহমদউল্লাহ সম্প্রতি সেকশন চিফ হয়েছে, সেটিও দেরিতে হাজিরাযোগ্য অবস্থান। সে জন্য বাসে উঠতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে 'কেন এই ব্যর্থ ছোটাছুটি, কাজটাজে কী লাভ'-এ রকম কোনো দার্শনিক ভাবনা ভাবছিল না, ভাবছিল শংকর নামটির উৎপত্তি কোত্থেকে? এই ভাবনাটি। সে কি বাবা শিবশংকরের জটা থেকে, নাকি বাঙালি-এক-শংকর জাতির শংকর থেকে, নাকি শংকরাচার্যের দর্শনদেউটি থেকে? আহমদউল্লাহ স্বভাবে গভীর চিন্তক, যে স্বভাবটি সাজেদা শীলার নেহাত অপছন্দ। সাজেদা শীলা, যদি জানতে চান, সম্পর্কে আহমদউল্লাহর প্রেমিকা, যদিও এই সম্পর্কটাকে সে অদূর-ভবিষ্যতে স্ত্রী পর্যন্ত নিয়ে যেতে ব্যগ্র। গভীর চিন্তক বলে শংকরনামার একটা সমাধান হয়তো করেই ফেলত আহমদউল্লাহ, কিন্তু তার মস্তিষ্কের যে জায়গা থেকে চিন্তার উৎপত্তি, মগজের সেই বাঁ দিকে আকাশ থেকে একটা ইট এসে পড়ল হঠাৎ। ঠিক আকাশ থেকে নয়, নির্মাণাধীন বাসিলা টাওয়ারের দশতলা উচ্চতা থেকে, আসলে। কিন্তু ফল হলো ওই একই- আহমদউল্লাহর মাথাটা থেঁতলে গেল, সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

তারপর যা হওয়ার তা-ই হলো। এ রকম ক্ষেত্রে আশপাশের মানুষজনের ভালোত্ব-মন্দত্ব দুটোই প্রকাশিত হয়। ভালোত্বটা আহমদউল্লাহর ক্ষেত্রে যা ঘটল : তাকে ধরাধরি করে কিছু লোক-নির্ঘাত অফিস অথবা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজকাম ফেলে হাসপাতালে নিয়ে গেল। আর মন্দত্বটা হলো : কে বা কারা তার পকেট কাটল ভিড়ের সুযোগে। তাতে আহমদউল্লাহর চিকিৎসা পাওয়াটা থেমে থাকল না বটে, যদিও ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা পাওয়া-না পাওয়া প্রায় একই কথা। কিন্তু দুটো দিন তার কোনো পরিচয়ই উদ্ধার করতে পারল না নার্স-ডাক্তার-ওয়ার্ডবয়রা অথবা একবার উঁকি মেরে চলে যাওয়া পুলিশের সার্জেন্ট। অচেতন আহমদউল্লাহকে সার্জেন্ট দুবার জিজ্ঞেস করল-মিয়া ভাই, নাম কী আপনার? কই থাহেন? আহমদউল্লাহ হয়তো একটা পদ্মদীঘির অতল থেকে শুনল তার কণ্ঠ। কারণ পুলিশের গলা, ভাই, অবচেতনের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এমনি শক্তিমান। কিন্তু কী বলবে সে?

কীভাবে? কারণ সকাল দশটা থেকে দশটা পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত ওয়ার্ড ঘুরতে আসা নিউরোলজির প্রফেসর আ ন ম রইসুদ্দিন পাটোয়ারী তার পেছন পেছন হাত জোড় করে ঘুরতে থাকা বিনীত ছাত্রছাত্রীদের বলেছেন, আই থিঙ্ক দিস কেইস ইজ ক্লিনিক্যালি ডেড। তিনি অবশ্য পূর্ণ একটি মিনিট আহমদউল্লাহকে পরীক্ষা করেছেন। তার প্রিয় ছাত্রী সাবিনা হুদার ইচ্ছা হচ্ছিল বিষয়টা আরেকটু তদন্ত করা, কিন্তু স্যার বলে কথা। তিনি ততক্ষণে আরো দুই পেশেন্ট দূরত্বে চলে গেছেন। আহমদউল্লাহর হয়তো মনে হচ্ছিল, সাবিনা হুদাকে হাত ধরে অনুরোধ করবে-আপা, একটু মাকে আসতে বলেন, বাবাকে বলেন, রহমতউল্লাহ, মোমিনউল্লাহ, সামিউল্লাহ, রুখসানা, আফসানা, দুর্দানাকে আসতে বলেন; এবং একটু লাজুক এবং অনিশ্চিতভাবে, সাজেদা শীলাকে আসতে বলেন। কিন্তু আহমদউল্লাহর যে অবস্থা! তার কথাগুলো, যদি সে বলে বা বলতেও পারে, ভাষা পাবে না, অবচেতনের দেয়ালে দেয়ালেই প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে যাবে।

আহমদউল্লাহর বাবা আজিজুল্লাহ মাস্টার, যিনি প্রকৃতই একজন মাস্টার ছিলেন, অর্থাৎ একটি স্টিমারের মাস্টার সুকানী, তার মাস্টারসুলভ চিন্তা-ভাবনা দিয়ে ছেলের অন্তর্ধান রহস্যের কোনোই কূলকিনারা করতে পারলেন না। প্রথমে তিনি এবং স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি ভেবেছিলেন আহমদউল্লাহ অফিসের পর টিউশনি সেরে কোথাও বেড়াতে গেছে অথবা বন্ধুবান্ধবের সান্নিধ্যে গেছে অথবা-এ চিন্তাটি রুখসানা, তার বড় মেয়ের-শীলার সঙ্গে দেখা করতে গেছে। কিন্তু রাত যত বাড়ল, তাদের দুশ্চিন্তাও বাড়তে থাকল। রুখসানা মোমিনউল্লাহকে নিয়ে জাফরাবাদের সবচেয়ে দয়ালু ফোন-ফ্যাক্সের দোকান 'মেসার্স মায়ের দোয়া ফোন ফ্যাক্স এন্টারপ্রাইজ'-এ গিয়ে নানান জায়গায় ফোন করেছে। এক পর্যায়ে নিজের মোবাইলে রুখসানা থেকে খবরটা পেয়ে সাজেদা শীলার মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। সে জানে, আহমদউল্লাহ এমন সোজা রাস্তার ছেলে, রাত নটা পর্যন্ত বাইরে থাকতে হলে বাপ-মায়ের অনুমতি নেয় সে তিনবার। শীলার হঠাৎ এ রকম শঙ্কা হতে শুরু করেছে যে, হয়তো পুলিশ ধরেছে তাকে। সামনে বিরোধী দলের মহাসমাবেশ, ব্যাপক ধরপাকড় চলছে। নিশ্চয় গ্রেপ্তার হয়েছে। কারণ একটু ভয় পেলে আহমদউল্লাহর চেহারাটা যে রকম সাদা হয়ে যায়, সেই সাদামুখে পুলিশ কেন, যেকোনো কর্তৃত্বকারী মানুষ যেকোনো কিছু পড়ে ফেলতে পারে। শীলা তার এই আশঙ্কার কথা বলল রুখসানাকে। বলে অবশ্য সে সামান্য ক্ষতিই করল। কারণ রহমতউল্লাহর মাথায় এসেছিল হাসপাতালগুলোতে একবার ঘুরে দেখা, যদিও স্বাস্থ্যশরীর বিষয়ে এমনি সুনাম আহমদউল্লাহর যে, এই চিন্তাটি রহমতউল্লাহর মতো হাসপাতালঘাঁটা মানুষ ছাড়া কারো মাথাতে আসারই কথা নয়। আহমদউল্লাহর মা ফ্রয়েডের মায়েদের মতো। প্রথমেই ছেলের কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে তিন সেকেন্ড ভেবেছেন, কিন্তু নাকচ করে দিয়েছেন। কারণ তার এই বড় ছেলের, বড় সন্তানের মতো সাবধানী মানুষ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। তবুও হয়তো পরিবারটি যেত হাসপাতালে-হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে, কিন্তু সাজেদা শীলার সন্দেহ তাদের বরং পাঠাল থানা থেকে থানাতে। দ্বিতীয় দিনের পুরোটা এবং তৃতীয় দিনের অর্ধেকটা গেল থানা এবং এসবি-ডিবি নানা অফিসে ধরনা দিয়ে দিয়ে। আর থানায় যাওয়া, ভাই, বিশেষ করে কোনো গ্রেপ্তারকৃত আহমদউল্লাহর খোঁজে, বহু টাকার মামলা। তৃতীয় দিনে দুপুরের খাবার খেতে বসে আজিজুল্লাহ হিসাব করলেন, দু হাজার সাত শ টাকা

শেষ। অথচ এই টাকা যে উপার্জন করে তুলে দিয়েছে তার হাতে, বস্তুত যার উপার্জনেই চলে সংসারটি, সেই আহমদউল্লাহরই কোনো খবর নেই। পুত্রকে খুঁজে না পাওয়ার উদ্বেগ/কষ্টের সঙ্গে কি তাহলে যোগ হতে যাচ্ছে 'অহন কি অইব? চলব কেমনে?' এর অনিশ্চয়তা? হায়!

আজিজুল্লাহ 'হায়' কেন, 'হায় হায়' করতেই পারেন-সারা দুপুর করতে পারেন। কারণ আহমদউল্লাহ, যাকে বলে পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। আজিজুল্লাহ নিজে চাকরি হারিয়েছেন এক বিরল স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়ে। আসলে তিনি নিজেও জানেন, চাঁদপুরের ভাসমান সেই পতিতাগোষ্ঠী থেকে দূরে থাকলে তার এই অবস্থা হতো না। যাক সে কথা। তার দ্বিতীয় ছেলেটির শারীরিক সমস্যা-পড়াশোনাটাও তেমন করা হয়নি তার, ভালো ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও। ডাক্তার বলে হৃৎপিণ্ডের দোষ। এই দেখুন না, ভাইয়ের খোঁজে আড়াই দিন ঘুরে ঘুরে সে বিছানা নিয়েছে। তৃতীয় ছেলেটি জগন্নাথ কলেজ থেকে এমকম পরীক্ষা দিয়েছে। চতুর্থটি পড়ে স্কুলে। আর মেয়েগুলো-তাদের কী আর পড়াশোনা যে, চাকরি পাবে? বড়টা বিএ পাস করে তিন বছর ঘরে বসে আছে, চাকরি বা বিয়ের দেখা নেই। দ্বিতীয়টাও পড়ছে বিএ, কিন্তু এই যে বিবাহযোগ্যা হচ্ছে এটিও, বস্তুত তৃতীয়টিও, কে দেবে তাদের বিয়ে? কীভাবে? হায় আহমদউল্লাহ! কোথায় গেলি বাবা?

কোথায় গেছে, সেটি ওই সাজেদা শীলাই খুঁজে বের করেছে। তার হঠাৎ মনে হয়েছেজ্জ রুখসানা ফোনটা ছেড়ে দেওয়ার পরই বস্তুত, না আহমদউল্লাহকে কোনো পুলিশ ধরবে না। এক সময় সে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর এপিএস ছিল কিছু দিন। সেই আইডি কার্ডটি যে শুধু সে যত্ন করে রেখে দিয়েছে তা নয়, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী তো তাকে স্নেহভরে মনেও রেখেছেন। কাজেই একটা টেলিফোন করতে, বিশেষ করে একজন প্রতিমন্ত্রীর কাছে, ঢাকার সবচেয়ে ব্যস্ত থানাতেও, কতক্ষণ লাগে?

তবে নিয়তির যে পরিহাস, তা তো সাজেদা শীলা জানে না। সেই আইডি কার্ডটি আহমদউল্লাহর মানিব্যাগ-চোর/চোরেরা গছিয়ে দিয়েছে বসের কাছে, আর বস কৌশলে সেখানে নিজের ছবি বসিয়ে খুব একচোট ব্যবসা করে নিয়েছে কয়েক মাস, হা!

সাজেদা শীলা নানান দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে তৃতীয় দিন সকালে আহমদউল্লাহর সন্ধানে বেরিয়েছে, আর প্রথম প্রচেষ্টাতেই-যেহেতু ঢামেক হাসপাতালটাই এ রকম ক্ষেত্রে যেকোনো অনুসন্ধানকারীর তালিকায় আগে আসে-সে পেয়ে গেছে তাকে। কিন্তু সাজেদা শীলা যা দেখল, অর্থাৎ যে অবস্থায় আহমদউল্লাহকে দেখল, তাতে সে সংজ্ঞা হারিয়ে নিজেই রোগী বনে গেল। তাকে সুস্থ-টুস্থ করে তুলে এক নার্স বলল, ইনি কে? শীলা এক সেকেন্ড না ভেবেই বলল, আমার স্বামী। তারপর নিচু কণ্ঠে বলল, হতে যাচ্ছেন। কিন্তু নার্স তার নিচু কণ্ঠ শুনল না। সে জন্য পরে অবশ্য কিছু জটিলতা হয়েছে, নার্সদের কাছে তার স্ট্যাটাস সংকট সৃষ্টি হয়েছে। সে কথা যথাসময়ে।

সাজেদা শীলা আহমদউল্লাহর বাড়ি বয়ে দুঃসংবাদটা জানিয়ে এল। দুঃসংবাদটা এমনি হৃদয়বিদারক যে, মেয়েটি কে? এই প্রশ্নও এল না কারো মনে। তবে রুখসানা জানে শীলা কে। কারণ আহমদউল্লাহর

সবচেয়ে প্রিয় বোন সে, যাকে সে সব কথা বলে এবং সে-ও সব কথা ভাইয়াকে বলে। রুখসানা কোনো প্রশ্ন করল না। শুধু এক মর্মভেদী চিৎকারে বাড়ি কাঁপিয়ে জানিয়ে দিল, সর্বনাশটা কত গভীর, কত ভয়াবহ।

প্রফেসর ডা. পাটোয়ারী নিশ্চয় আগের জন্মে গ্যালেন ছিলেন। তিনি এক মিনিট দেখে যে রায় দিলেন, সেটি যেন অলক্ষ্যে বসা দিন দুনিয়ার হাকিম ওকে করে দিলেন। এমনি নির্ভুল তার রোগব্যবচ্ছেদ ক্ষমতা। ক্লিনিক্যালি ডেড কেইসের কী হয়? শুধু প্রাণটা থাকে, প্রাণটা ধুকপুক করে দেহের অবশিত খাঁচার গভীর-ভেতরে। কেইসটা শুয়ে থাকে, কিন্তু থাকে না আসলে। ক্লিনিক্যালি ডেড যারা, আহমদউল্লাহর মতো, তাদের বাঁচা-মরার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। তাহলে কীভাবে বুঝব একজন বাঁচা আহমদউল্লাহ কি সত্যি বাঁচা, না মরা আহমদউল্লাহ? বুঝবেন প্রধানত দুই প্রকারে : প্রথমত. তার দেহটা মাটির নিচের পরিবর্তে হাসপাতালের বিছানায় শায়িত, আর দ্বিতীয়ত, তার শিয়রে একটা সমাধিপাথরের পরিবর্তে স্থাপিত দয়াময়ী মাতা।

দয়াময়ী মাতা কাঁদছেন। তিন সপ্তাহ হয়ে গেল, ছেলের জীবনটা একটা সুতোয় মাত্র আটকানো শরীরের সঙ্গে। তিনি তার কান্না দিয়ে, প্রার্থনা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে নিয়তির হাতের কাঁচিটাকে আটকে রেখেছেন। এই কান্না-প্রার্থনার মিছিলে যোগ দিয়েছে আহমদউল্লাহর প্রিয় ভাই ও বোনেরা। আর বেচারা সাজেদা শীলা! সে ওয়ার্ডের বারান্দায় ঘোরে, দরজা দিয়ে উঁকি মেরে তাকায়-যেহেতু, মেয়েটি কে? এই প্রশ্নের সম্মুখীন সে হতে চায় না। নার্সগুলো অবাক হয়েছে, এ কেমন স্ত্রী? স্বামী থেকে দূরে দূরে থাকে? দেখেশুনে তাদের একজন অবশ্য এ রকম সিদ্ধান্তে এসেছে : মৃগী রোগী নিশ্চয়, সামনে গেলে নিজেই কেইস বনে যাবে। রুখসানা সুযোগ বুঝে দু-একবার তাকে ডেকে নিয়ে গেছে। সে নিষ্পলক দেখেছে আহমদউল্লাহর প্রস্তরিত মুখটি। আর ডুকরে কেঁদেছে। এই দৃশ্য দেখে নার্সরা আরো চিন্তায় পড়েছে। কিন্তু শীলাকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। সে কারো সঙ্গে কথা বলে না। একবার মা গিয়েছেন বাথরুমে, ভাই-বোনেরা দুপুরের খাবার খেতে বাড়ি, শীলা সেই ফাঁকে আহমদউল্লাহর মাথাটি নিজের বুকে নিয়ে একবুক হাহাকার এবং তার অসম্ভব হয়ে পড়া স্ত্রীত্ব এবং আরো অসম্ভব মাতৃত্বের দীর্ঘ দীর্ঘ সব হাহুতাশ শুনিয়েছে আহমদউল্লাহকে। সেই স্পর্শে আহমদউল্লাহর প্রাণপাখি অবচেতনের জানালায় ডানা ঝাপটে মুক্তি চেয়েছে। কিন্তু জানালা যে বন্ধ!

ভাই-বোন যখন খেতে গেছে বাসায়, আজিজুল্লাহ মাস্টার তাদের সঙ্গে বসে একটা ছোট হিসাব করেছেন। এক মাস হয়ে গেল। এ পর্যন্ত কোনোভাবে চলেছে। কিন্তু আর কত দিন? আগামীকাল পাতে কী পড়বে? পরিবারের কাছে এই নতুন উদ্বেগটি কষ্টের তুফানের সঙ্গে ধেয়ে আসা অনিশ্চয়তার জলোচ্ছ্বাসের মতো নিষ্ঠুর মনে হয়েছে।

কাজেই ছেলেমেয়েরা যে যার মতো একটা উপায় খোঁজার পথে নেমেছে। উপায় খোঁজা মানে টাকার সন্ধান। অর্থাৎ চাকরি। এমনকি দুর্বলহৃদয় রহমতউল্লাহও নামল চাকরির খোঁজে। রুখসানাও। এবং রুখসানার কপালটা দেখা গেল এ ক্ষেত্রে সবার থেকে ভালো। সে চোখে পড়ল ঢামেক হাসপাতালের

শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. জুনাইদুল হকের। জুনাইদুল হক, ডাক্তারি ছাড়াও সাহিত্য করেন, একটা কাগজে-কলাম লেখেন ছদ্মনামে, যা পড়ে মনে হয় তার ভেতরের মানুষটি এই রোগ-শোক-আবর্জনা-দালাল অধ্যুষিত হাসপাতালের জন্য একেবারেই উপযুক্ত নয়। জুনাইদুল রুখসানাকে কাঁদতে দেখে ব্যথিত হয়েছেন। সেই কান্নায় ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসার যে গভীর প্রকাশ তিনি দেখেছেন, তা তাকে স্পর্শ করেছে। তিনিও আহমদউল্লাহকে দেখে হতাশ হলেন। এবং তাকে দেখতে গিয়ে তিনি ওই তুফানের সঙ্গে জলোচ্ছ্বাসের ব্যাপারটাও বুঝলেন। একটা কিছু কি করা যায় মেয়েটার জন্য?

তিনি স্ত্রীকে ফোন করলেন। স্ত্রীর বাড়ি ফতুল্লা। ফতুল্লা ভালো মানুষের জায়গা। ফতুল্লার মানুষ বিশাল হৃদয়ের হয়, এ আমিও দেখেছি। মিসেস জুনাইদুল হক তার প্রমাণ। ফতুল্লায় মিসেস হকের এক বন্ধুর স্বামীর একটা বড় গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি আছে। তিনি তাকে অনুরোধ করে রুখসানার একটি চাকরি জুটিয়ে দিলেন। একবারেই ম্যানেজারের অ্যাসিসটেন্ট। অবাক!

রুখসানার চাকরিটা একটা সান্ত্বনার মতো হয়ে এল পরিবারটির জন্য।

দু মাসের মাথায় চাকরি পেল মোমিনউল্লাহ, এক শপিং মলের সুপারভাইজার হলো সে। সেখানে একটা ফাস্টফুডের দোকানে সে ঢুকিয়ে দিল দুর্বলহৃদয় অগ্রজকে। অগ্রজের কাজ দোকানের তদারকি, ক্যাশ দেখাশোনা, খদ্দেরদের খুশি রাখা। এ ক্ষেত্রে তার সুবিধা হলো, খদ্দেরদের নব্বই শতাংশ তরুণ ও তরুণী। তারা মুখোমুখি বসে থাকতে এবং কথা বলতেই বেশি আগ্রহী। খাদ্যে নয়। কারণ এ দোকানের খাদ্য ভয়াবহ।

সেই দোকানে বসে বসে একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে গিয়ে রহমতউল্লাহর দুর্বল হৃদয় আরো দুর্বল হলো। মেয়েটা প্রায় প্রতিদিন আসে, একটি ছেলের জন্য অপেক্ষা করে। ছেলেটি কোনো দিন আসে কোনো দিন না। রহমতউল্লাহ দোকান বন্ধ করা পর্যন্ত মেয়েটির জন্য বসে থাকে। সে জন্য আহমদউল্লাহকে দেখতে যেতে সে পারে না নিয়মিত।

মমিনউল্লাহও পারে না। রুখসানাও না। তবে একজন যায় প্রতি দিন, মা এবং বাবা ছাড়া, সে হচ্ছে, হ্যাঁ ভাই, ঠিক ধরেছেন, সাজেদা শীলা। বেচারা!

তবে চার মাসের মাথায় শীলার সঙ্গে দেখা হলো ডা. জুনাইদুল হকের অ্যাসিস্টেন্ট ডা. আফতাবুল আলমের। লম্বা-চওড়া মানুষ। বেশ হাসিখুশি। শিশুবান্ধব বলতে যা বোঝায়। তবে এক সময় তিনি শীলাবান্ধব হয়ে গেলেন। তিনি শীলাকে কাঁদতে দেখে সান্ত্বনা জানাতে গিয়েছিলেন। ঢামেক হাসপাতালে শত শত মানুষ ডেইলি কাঁদে, কিন্তু তাদের, ভাই, সান্ত্বনা কে জানায়? অবশ্য তাদের মধ্যে শীলার মতো সুন্দরী মেয়ে থাকলে ভিন্ন কথা। সেটাই হয়েছে। আর শীলা সান্ত্বনা পেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। তাতে ডা. আলমের শীলাবান্ধবতা বাড়ল।

একদিন রুখসানা তার অনিয়মিত হতে থাকা ভিজিটে এসে শীলাকে দেখল ডা. আলমের সঙ্গে কথা বলতে। কথা বলার ভঙ্গিটা তার ভালো লাগল না। সে শীলাকে ডেকে কথাটা বলল। শীলা তাতে এই প্রথমবারের মতো রুখসানাকে দুটি কথা শুনিয়ে দিল।

তাদের কথাবার্তার এক পর্যায়ে 'জিন্দা লাশ' কথাটি এল। তবে কে বলল, সেটি হাসপাতালের নানা শব্দে চাপা পড়ে আমাদের কান পর্যন্ত এল না। দুঃখিত।

আহমদউল্লাহর তখন ষষ্ঠ মাস চলছে জিন্দা লাশত্বের। এরই মধ্যে একদিন ডা. আ ন ম রইসুদ্দিন পাটোয়ারী তাকে পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড দেখে তার লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম টার্মিনেট করা-না করার নৈতিক প্রসঙ্গটি তুললেন তার ছাত্রছাত্রীদের কাছে। জিন্দা লাশের প্রতি দয়াই দেখানো হয় তাতে। কারণ এই সবজির মতো জীবন কি আসলে জীবন?-এ রকম একটা মত এল। একজন বলল, স্যার, ইউথানাসিয়ার বোধ হয় এটি একটি উত্তম কেস। ইউথানাসিয়া হচ্ছে, যদি জানতে চান, মার্সি কিলিং, অর্থাৎ দয়াশীল হত্যা। সাবিনা হুদা এতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল। বলল, এটি খুবই অনৈতিক, কাউকে খুন করাটা খুনির কাজ, জল্লাদের কাজ। এটা কি ডাক্তারের কাজ? সাবিনার কথা শুনে ডা. পাটোয়ারী বিরক্ত হলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। কেননা, এই বেহুদা আলোচনা তিনিই শুরু করেছিলেন।

ঠিক সাবিনা হুদার কারণে নয়, এমনিতেই আহমদউল্লাহর জিন্দা লাশত্ব বজায় থাকত। কারণ ইউথানাসিয়ার চল আমাদের দেশে নেই। তা ছাড়া আত্মীয় পরিবেষ্টিত রোগীর লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম ডিসকানেক্ট করবে, এ রকম সুযোগই বা কার কোথায়? এই 'পরিবেষ্টনার' কথাটা অবশ্য আহমদউল্লাহর ক্ষেত্রে ঠিক হলো না। পরিবেষ্টনা দূরে থাক, কোনো কোনো দিন কেউ-ই থাকে না তার আশপাশে। ব্যাপারটা কী? না তেমন গুরুতর কিছু নয়, ভাই-বোনরা এখন কাজে ব্যস্ত, বেচারারা সময় পাচ্ছে না। আজিজুল্লাহ হাসপাতালের গন্ধ সহ্য করতে পারেন না। তার খালি বমি হয়। ইচ্ছা থাকলেও তিনি আসতে পারেন না। মা হাসপাতালের টয়লেটে পা পিছলে পড়ে কোমরে ব্যথা পেয়েছেন। এখন বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আর সামিউল্লাহ আর দুর্দানা একা একা কীভাবে থাকে, ভয়ানক এই হাসপাতালে?

ডা. পাটোয়ারীর রাউন্ড শেষ হয়ে গেলে সাবিনা হুদা কিছুদূর তাকে এগিয়ে দিল সহপাঠীদের সঙ্গে। তারপর ফিরে এসে দাঁড়াল আহমদউল্লাহর বেডের সামনে। তার হাতটা নিয়ে অভ্যাসবশত পালস্ দেখল। চোখের পাতা টেনে খুলল এবং সামান্য খোলা চোখের অস্বচ্ছ, ঘোলাটে দৃষ্টি দেখে একটু চমকালো। তারপর আহমদউল্লাহর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, আমার কথা শুনছেন? শুনতে পারছেন?

উত্তর নেই, যথারীতি। উত্তর কীভাবে দেবে আহমদউল্লাহ? সাবিনা খুব বিষণ্ন বোধ করল। আজ সকাল থেকে-বেশ কদিন থেকেই, বস্তুত তার মন খারাপ। কেন, কে জানে। কিন্তু সাবিনার কণ্ঠ দূর থেকে

ভেসে আসা একটা গানের মতো আহমদউল্লাহর গভীর অবচেতনে পৌঁছে গেল। সেই পদ্মদীঘির অতলে। সেখানে কাঁপন উঠল। আহমদউল্লাহর ভেতরের মানুষটি সেই কাঁপনে অস্থির হয়ে পড়ল। তার দুই ডানার ঝটপটানি শুরু হয়ে গেল। অবচেতনের কাচের ঘরের দেয়ালে আঘাত দিতে দিতে আহমদউল্লাহ একটুখানি মুক্তির আকুল আবেদন জানাতে লাগল তার চারদিকের জমাট শূন্যতার কাছে। এবং আশ্চর্য, তৃতীয়বার যখন তাকে জিজ্ঞেস করল সাবিনা হুদা, আপনি কি শুনছেন? শুনতে পারছেন? তার নরম বিষণ্ন কণ্ঠ আহমদউল্লাহর অবচেতনের ঘরের কাচের দেয়ালগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। আর ডানা ঝটপট করে জমাট হাওয়ার ভেতর দিয়ে উড়াল দিল আহমদউল্লাহ। অবাক! ভেতরের আহমদউল্লাহ মুক্তি পেয়ে যখন হাসপাতালের বিছানার ওপর ভাসতে থাকল, তার মনে হলো, এ রকম হালকা সে জীবনে কখনো অনুভব করেনি। সাবিনা হুদাকে তার মনে হলো যেন কোনো ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল অথবা মাদার তেরেসা। তাকে চুমু খেতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু এত মানুষের সামনে কীভাবে তা করে সে? আহমদউল্লাহ দেখল, সাবিনা হুদার ভেতরে প্রচুর বিষণ্নতা। ডা. আফতাবুল আলম তাকে খুব অবহেলা দেখাচ্ছেন আজকাল। তার সঙ্গে একটি মেয়ের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে দেখেছে সাবিনা। কিন্তু সাবিনার ব্যক্তিত্ব প্রবল, সে কখনো জিজ্ঞেস করবে না ডা. আলমকে, মেয়েটি কে? অথবা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করবে না কী সম্পর্ক তোমাদের মধ্যে?

সাবিনা হুদার কষ্টজর্জর মনের দেয়ালে সাজেদা শীলার ছবি দেখে চমকে উঠল আহমদউল্লাহ। সে কি ভুল দেখছে? এক সুদর্শন পুরুষের বাহুলগ্না সে। মাগো! লোকটি কে? লোকটি কেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে অবশ্য তার দেরি হলো না। সাজেদা শীলার সন্ধানে নেমে তাকে সে পেয়ে গেল ডা. আলমের ঘরে। বসে বসে পেপার পড়ছে আর ডা. আলম প্রেসক্রিপশন লিখছেন মায়ের কোলে এলিয়ে পড়া এক বিবর্ণ বাচ্চার জন্য। প্রেসক্রিপশন লেখার পর তিনি মাকে তা বুঝিয়ে দিলেন, তারপর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। এরপর চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বোলালেন। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে সাজেদা শীলার হাত থেকে পেপারটা কেড়ে নিয়ে তাকে একটা চোরাগুপ্তা চুমু দিলেন। শীলা যে খুব অবাক হলো এই আকস্মিকতায়, তা নয়। মনে হলো সে তৈরিই ছিল। তবে চুম্বন পর্বের পর সে যে ডা. আলমকে 'দুষ্টু' বলে মধুর বকা দিল, তাতে আহমদউল্লাহর মনে হলো, তার জগতের অবশিষ্ট খাম্বাটি ভেঙে পড়ল।

কেননা, তার জীবনে একটিবার যে সে শীলাকে চুম্বন করেছিল, সেবার এই মধুর 'দুষ্টু' বকাটা সে তাকেই বকেছিল।

বেচারা আহমদউল্লাহ। তার বুঝতে বাকি থাকল না ঘটনাটা কী ঘটেছে। তার কান্না পেল। প্রচুর কান্না। তার মায়ের কথা মনে পড়ল। এবং মনে পড়তেই সে রওনা দিল বাড়ির দিকে।

দুপুরের খাবার খাচ্ছেন আজিজুল্লাহ। পাশে বসে তাকে যত্ন করে খাওয়াচ্ছেন মিসেস আজিজুল্লাহ। খাচ্ছে সামিউল্লাহ দুর্দানাও। আহমদউল্লাহর নাকে মায়ের রান্নার গন্ধ লাগতে তার খুব ক্ষিধা লাগল।

কিন্তু কীভাবে খায় সে? তার নাকে স্যালাইনের নল। এই নল শত চেষ্টাতেও সে সরাতে পারবে না। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে সে মাকে বলল, মা আমার নাক থাইকা নলটা সরাইয়া একটু খাওয়াইয়া দেও। আমার বড় ক্ষিধা।

মা বললেন, আমার কোমর মোচড়াইয়া গেছে। আমি কেমনে মন্টুর দেখাশোনা করমু? একটা নার্স রাহন যায় না?

বাবা বললেন, পয়সাটা কে দিব হুনি? ঝন্টু রন্টুর এমন কী আয়-উপাজ্জন কও?

আহমদউল্লাহ অবাক হলো, কী হচ্ছে বাড়িতে? কেউ তাকে পাত্তা দিচ্ছে না একদম। একটু পরে অবশ্য ব্যাপারটা সে বুঝল। মা-বাবার কথোপকথন থেকে সে জানল, দু ভাই চাকরি পেয়েছে, রুখসানা চাকরি পেয়েছে। তার একটু অবশ্য খুশি লাগল, কারণ তার অবর্তমানে বাবা-মাকে না খেয়ে থাকতে হয়নি। সে বলল, মা, আমার ক্ষিধা লাগছে, তবে অহন খামু না। রহমত-মোমিন-রুখসানা আইলে খামু।

এই বলে সে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল। তিন কামরার বাড়ি। তার একটি একরত্তি, তাতে শুধু একটা চৌকি ফেলার জায়গা আছে। সেই ঘরটাতে আহমদউল্লাহ থাকে। একটি ঘরে বাবা-মা আর বোনগুলো, অন্য ঘরে ভাইগুলো। সে নিজের ঘরে গিয়ে দেখল, সেখানে এখন রহমতউল্লাহ থাকে। তার নিজের কোনো জিনিসপত্র সে ঘরে নেই। শুধু তার যে ভালো শার্টটা ছিল, মেরুন রঙের, সেটি ঝুলছে বিছানায় ওপর টানানো দড়িতে, সেটি এখন রহমতউল্লাহ ব্যবহার করছে।

বিছানার পাশে একটা টুলের ওপর তার একটা অ্যালার্ম ঘড়ি ছিল, কলম ছিল, আফটার শেভের বোতল ছিল। কিছুই নেই। সেগুলো ছোট অন্য দু ভাই ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছে।

আহমদউল্লাহ চোখের পানি আটকে রেখে ছুটে গেল খাবার টেবিলের পাশে। মাকে বলল, মা, আমার ঘরটা ক্যান দখল হইয়া গেল?

মা বললেন, আপনে যা বুঝেন করেন।

বাবা বললেন, এইভাবে কইও না। এইভাবে কইলে কথাটা খারাপ লাগে।

মা বললেন, এই রকম কথা আর কীভাবে কইতে হয়, আমারে জানাইবেন।

আহমদউল্লাহর মনে হলো, তাকে নিয়ে একটা সংকট সৃষ্টি হয়েছে বাড়িটাতে। সংকটের কারণটাও সে আস্তে আস্তে বুঝতে পারল। তবে এ নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আপাতত তার ঘুম পাচ্ছে। রহমতউল্লাহ দখল করে ফেললেও বিছানাটা এখন খালি। সে তাতেই শুয়ে পড়ল।

ঘুম থেকে উঠল সে রুখসানার চিৎকার শুনে। রুখসানা বলছে মাকে, এসব কী হচ্ছে মা?

রুখসানা বরাবর শুদ্ধ বাংলায় কথা বলে। ছোট ভাইবোনগুলো প্রায় সবাই, বস্তুত। মা বললেন, কী অইছে তুমি না কইলে আমি জানি কেমনে? রুখসানা বলল, মেজ ভাইয়া একটা মেয়ের সঙ্গে একটা কাণ্ড ঘটিয়েছে আজ।

রুখসানার কথা শুনে মায়ের চোখ কপালে উঠে গেল।

রুখসানার সঙ্গে মায়ের কথোপকথন থেকে আহমদউল্লাহ যা শুনল : মোমিন একটা ফাস্টফুডের দোকানে চাকরি করে। সেখানে ওই মেয়েটি রেগুলার কাস্টমার। তার প্রেমে পড়েছে রহমতউল্লাহ। মেয়েটার একটা ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, কিন্তু ছেলেটি তাকে তত পাত্তাটাত্তা দেয় না। কিছুদিন আগে মোমিন মেয়েটির সঙ্গে কথা বলেছে, আজ মনের ভাব প্রকাশ করেছে। মেয়েটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। রুখসানাকে ফোন করে মোমিনউল্লাহ এই কথা জানিয়েছে। আহমদউল্লাহ রুখসানাকে জিজ্ঞেস করল, মেয়েটা কী কইল? রুখসানা বলল, না মা, আমি সেকথা বলছি না। মেজ ভাইয়া এই মেয়েটিকে না হয় বিয়ে করল। সেটাই মনে হচ্ছে হতে যাচ্ছে। কিন্তু মেয়েটি কি ভাইয়াকে সত্যি সত্যি ভালোবাসতে পারবে? যদি ওই ছেলেটা ফিরে পেতে চায় মেয়েটিকে, কোনো কারণে, কোনো দিন, তখন কী হবে?

মা বললেন, আমি কিছু বুঝি না, আমারে জিগাইও না।

রুখসানা বলল, ভাইয়ার কথাটা মনে নাই? সেই মেয়েটা, সাজেদা শীলা না কী যেন নাম, তার কথা মনে নেই? সে কী করল? সে এখন এক ডাক্তারের সঙ্গে লাইন দিচ্ছে।

এবার আহমদউল্লাহর চমকে ওঠার পালা। চমকে ওঠার পর সকালের কষ্টটা ফিরে এসে আহমদউল্লাহর চোখ ভিজিয়ে দিল। তার ভেজা দৃষ্টিতে ধরা পড়ল : রুখসানা বেসিনের ওপরে বসানো আয়নায় মনোযোগ দিয়ে নিজের চেহারা দেখছে। এবং তার কানে এল রুখসানার গুনগুনিয়ে পাওয়া গান। সে অবাক হলো, রুখসানা গান গাইছে? আহমদউল্লাহ শুয়ে আছে হাসপাতালে, জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে, একটুখানি টোকা পড়লে আড়ালটা মুছে যাবে, আর রুখসানা গান গাইছে?

আহমদউল্লাহর জন্য আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। রাতে রহমতউল্লাহ মোমিনউল্লাহ ফিরে এলে বাড়িতে রীতিমতো হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। রহমতকে চেপে ধরেছে রুখসানা, বল, মেজ ভাইয়া, এই মেয়েটিকে কেন তুমি পছন্দ করলে, সব জেনে-শুনে? রহমতউল্লাহ কিছু না বলে মিষ্টি হেসে একটা প্যাকেট এগিয়ে দিয়েছে রুখসানার দিকে। রুখসানা 'কী এটা? কী এটা?' বলতে বলতে দ্রুত ছিঁড়ে ফেলেছে প্যাকেটটি এবং একটি থ্রিপিস আবিষ্কার করে সুখের একটি চিৎকার দিয়ে রহমতকে জড়িয়ে ধরে বলেছে, থ্যাঙ্ক ইউ ভাইয়া। তারপর, কিছুটা ধাতস্থ হয়ে বলেছে, এখন বল মেয়েটি কেমন?

আহমদউল্লাহ অবাক হয়ে দেখল, ভাই-বোন মিলে এমন হৈ-হুল্লোড় করছে যেন এই বাড়িতে একটি যে বড় ছেলে ছিল, যে ছেলেটি হাসপাতালে শুয়ে আছে সাত দিন আগে কেনা সবজির মতো, এ কথাটা সবাই ভুলে গেছে। অনেকক্ষণ ভাইবোনদের ঘরে সে বসে থাকল, কিন্তু তার কথা কেউ বলল না। এমনকি যে দুর্বল হৃদয় রহমতউল্লাহর বিয়ে নিয়েও কথা হলো, তাতেও একটা সম্ভাব্য তারিখ ফেলার সময় কেউ একবার বলল না, ভাইয়াটা যদি সুস্থ হয়ে যেত এর মধ্যে, কী ভালো হতো! এরকম একটি আক্ষেপও যেন বাঁচিয়ে দিত তাকে, আহমদউল্লাহর সেরকম মনে হতে লাগল।

ভাই-বোন যখন খেতে বসল, তখন একটি খালি চেয়ারে বসতে গিয়ে তাকে থেমে যেতে হলো। বাবা বসে পড়েছেন। অথচ আহমদউল্লাহর ভারি ক্ষিধা লেগেছে। মাকে বারে বারে বলছে, কিন্তু মা ব্যস্ত তার কোমরের ব্যথা নিয়ে। বেচারা, ব্যথাটা নিশ্চয় বেশি। ভাইবোন খাচ্ছে আর হাসছে, কথা বলছে। এরই মধ্যিখানে বাবা তুললেন সেই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা, যা নিশ্চয় প্রতিদিনই আলোচিত হচ্ছে। ভাইবোনের প্রতিক্রিয়া দেখে অন্তত তা-ই মনে হলো। কথাটা ডা. পাটোয়ারীর সেই বিতর্কেরই সামান্য রূপান্তর। আহমদউল্লাহ অনেকক্ষণ পর নিজের নামটা উচ্চারিত হচ্ছে শুনে কান খাড়া করল। কিন্তু নিজের কানকেই সে বিশ্বাস করতে পারল না যখন নির্লিপ্ত গলায় বাবা বলে যেতে লাগলেন, ডাক্তারদের ধারণা আরো ছয় মাস কেন, ছ বছরেও তার সবজি-জীবন উন্নত হবে না। সবজিটা আরো নিরস হবে ধীরে ধীরে। তারপর যা হওয়ার তা। হাসপাতাল বলছে আর রাখা যাবে না, বাড়ি নিয়ে যান। আরো ভালো হয় লাইফ সাপোর্ট টার্মিনেট করে দিলে। তবে সেটা পরিবারের সিদ্ধান্ত। আহমদউল্লাহ বুঝতে পেরেছে, মা চাইছেন তাকে বাসায় নিয়ে আসতে এবং তার দেখাশোনার জন্য একটা নার্স রেখে দিতে। কিন্তু রাখবে যে, জায়গাটা কোথায়? কোন ঘরে? তা ছাড়া, নার্স রাখার পয়সা কে দিবে? রহমতউল্লাহর সেই সাধ্য নেই। তা ছাড়া সামনে তার বিবাহ। আহমদউল্লাহর মনে পড়ল, এই এক বছরও হয়নি, ঝন্টুর কার্ডিয়াক চেকআপ হয়েছিল কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালে, আর তাতে খরচ হয়েছিল ৮২০০ টাকা। সেই টাকাটা আহমদউল্লাহ জোগান দিয়েছিল তার টিউশনির টাকার সঞ্চয় থেকে।

সাজেদা শীলা বলেছিল, কিছুটা আক্ষেপের সুরে, বিয়েটা কি তাহলে এক বছর পেছাল?

সে বলেছিল, না, আট মাস।

আহমদউল্লাহ প্রসঙ্গের ইতি অবশ্য দ্রুত টেনেছে ভাইবোনরা। বিষয়টা তারা মা-বাবার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। তারপর রহমতউল্লাহর বিবাহ বিষয়ে আলোচনায় মগ্ন হয়েছে। আহমদউল্লাহ আস্তে বেরিয়ে দরজার পাশে চেয়ারটাতে বসে পড়ল। বসে বসে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। অনেক রাতে ঘুম ভাঙল তার। সে ভাবল, কোনো একটা বিছানায় গিয়ে শুলে কেমন হয়। কিন্তু সে দেখল, সবগুলো বিছানা দখল হয়ে গেছে। রহমতউল্লাহ এই গভীর রাতেও একটা ক্যাসেট রেকর্ডারে অনুচ্চ আওয়াজে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনছে। তার চোখ ভরা স্বপ্ন এখন, অথচ এই শখটাজ্জ এই একটা ক্যাসেট রেকর্ডারের এবং রাতে অনুচ্চ আওয়াজে গান শোনার শখজ্জ খুব প্রবল ছিল আহমদউল্লাহর, কিন্তু পূরণ করা হয়ে ওঠেনি কোনো দিন।

মা ঘুমাচ্ছেন, বাবা ঘুমাচ্ছেন। নিঝুম বাড়িতে শুধু ঘুমের শব্দ। সে কিছুক্ষণ পায়চারি করল, তারপর দরজা খুলে আস্তে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। বাইরে সুন্দর একটা হাওয়া দিচ্ছে। আকাশটা মেঘলা, রাস্তায় এখানে সেখানে এক-আধটু পানি। সন্ধ্যায় বৃষ্টি হয়েছে, এখন বৃষ্টি নেই। এখন রাত্রির নির্জনতার সঙ্গে ফাগুন শেষের একটা নরম কিসের স্পর্শ যোগ হয়েছে। যেন কারো আঙুল তার চোখের পানি মুছে দিচ্ছে। খুব সঙ্গোপনে।

তার কেন জানি সাবিনা হুদার কথা মনে পড়ল। তার খুব ইচ্ছা হলো সাবিনা হুদার সঙ্গে কথা বলার। কিন্তু কোথায় সে থাকে, জানে না। হয়তো ধানমন্ডিতে, হয়তো দক্ষিণ গোরানে। এই শহরের আকীর্ণ ভূগোলে তাকে কীভাবে খুঁজে পায় সে?

অতএব হাসপাতালেই ফিরতে হলো তাকে। সেখানে অন্তত একটা বিছানা আছে তার। আপাতত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এটিই তার একমাত্র ঠিকানা।

হাসপাতালে পৌঁছে ওয়ার্ডে ঢোকার মুখে খুব পুলকিত অবাক হলো আহমদউল্লাহ। ইন্টার্নি ডাক্তারের টেবিলে বসে আছে সাবিনা হুদা। নিশ্চয় নাইট ডিউটি। দু হাতে মাথা ধরে টেবিলে হাত দুটি রেখে সামনে ঝুঁকে বসে আছে, যেন টেবিলের কাঠে এক গুরুত্বপূর্ণ বাণী খোদাই করা আছে তার জন্য, এবং সে গভীর মনোযোগ দিয়ে তা পড়ছে। আহমদউল্লাহও ঝুঁকে পড়ে দেখল টেবিলটা। হ্যাঁ খোদাই করা একটা বাণী দেখা যাচ্ছে। সেটা সেও পড়ল। সেখানে স্পষ্ট লেখা, বিদায়।

সে আস্তে ডাকল সাবিনাকে। আপা?

সাবিনা মাথা তুলল। আহমদউল্লাহ একটা চেয়ার টেনে তার পাশে বসল। আপা, সে বলল, মন খারাপ করবেন না।

না মন খারাপ করিনি, সাবিনা বলল, এমনি নানা কিছু ভাবছি।

তার মধ্যে ইউথানাসিয়ার বিষয়টা কি আছে?

কেন? সাবিনা জিজ্ঞাসা করল।

কারণ আজ আমাকে আপনি সেই শেষ চিকিৎসাটা দেবেন। আপনার কাছে এটা আমার আর্জি। সাবিনা গভীরভাবে তাকাল আহমদউল্লাহর দিকে। তার ঘোলাটে অস্বচ্ছ চোখে তখন অনেক কথা। অনেক কাহিনী। সেগুলো সাবিনা পড়ল। পড়তে পড়তে সাবিনার চোখ ভিজে গেল।

সাবিনা বলল, আজ রাতেই?

আজ রাতেই।

ঠিক আছে।

আপনার কোনো আপত্তি নেই তো? নৈতিক আপত্তি?

কাল পর্যন্ত ছিল, সাবিনা বলল। আজ নেই। আজ আপনার চোখটা পড়েছি আমি। এরপর আমার যেটুকু আপত্তি ছিল চলে গেছে।

অনেক ধন্যবাদ।

****

Released For MurchOna by Mojammel Hussain Toha
For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum

মোজাম্মেল হোসেন ত্বোহা কর্তৃক সংগৃহীত

সৌজন্যে - প্রথম আলো

প্রথম আলো অনলাইন সংস্করণ

ঈদ সংখ্যা 2004 – (ঈদ-উল-ফিতর)

আরো বাংলা সাহিত্য সংগ্রহ করতে হলে
ভিজিট করুন এই সাইটগুলো :

http://www.somewhereinblog.net/blog/toha_mhblog/category/10559

http://tohamh.googlepages.com/shahitya